দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of International Relations) :

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিভিন্ন তাত্ত্বিক লেখক দেখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। স্বভাবতই তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে। এই নানা ধরনের সংজ্ঞার মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য তা স্থির করতে হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কারণ কোনও বিষয়ের সংজ্ঞা হল তার প্রকৃতিরই এক ছোট আকারের বিবরণ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। এই মতপার্থক্যের কারণ হল এই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিদ্যায় আলোচনা ও অনুসন্ধানের বিষয় কী হবে এই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা একমত নন। যেমন কেউ কেউ মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণ ও বিবরণ। এঁদের চোখে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞ হান্‌স মরগেনথউ (Hans Morgenthau) এই ধরনের মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বই হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল কথা। যেহেতু তাঁর বিচারে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সমার্থক সে কারণে তাঁর দেওয়া মানদণ্ডের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা তৈরি করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে হয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল ক্ষমতার লড়াইয়ের বিবরণ ও বিশ্লেষণ।

এই ধরনের সংজ্ঞা অবশ্য নেতিবাচক। কারণ আধুনিক আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতার যে ইতিবাচক দিকটি রয়েছে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এটি শুধু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এছাড়া মনে রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এলাকা আন্তর্জাতিক রাজনীতির এলাকার চেয়ে অনেক বড়। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কই হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচার্য বিষয়। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা শুধু রাজনৈতিকই নয়, তা একই সঙ্গে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, আইনগত, সামরিক, ইত্যাদি। আবার রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক আজ শুধু সরকারি স্তরে আবদ্ধ থাকে না, নানাভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারি স্তরেও।

সঙ্গত কারণেই তাই নর্মান ডি পামার (Norman D. Palmer) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে তাকে পৃথক করেছেন। অধ্যাপক পারকিন্‌স (H.C. Perkins)-এর সঙ্গে মিলিতভাবে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিশ্বভূখণ্ডে বসবাসকারী বিভিন্ন জনসমাজ ও গোষ্ঠীর যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা ও বিশ্লেষণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এইভাবে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হলে ট্রিগভি ম্যাথিয়েসেন (Trygve

গ্রাহ্য সংজ্ঞা

Mathiesen)-এর দেওয়া সংজ্ঞাটিই সবচেয়ে ভাল বলে মনে হয়। ম্যাথিয়েসেন-এর কথায় ঃ *সরকারি বা বেসরকারি স্তরে রাষ্ট্র-সীমানা সাপেক্ষ নয় এমন অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও অন্যান্য যে সব সম্পর্ক গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারবার তাদের নিয়ে* ("International Relations embraces all kinds of relations traversing state boundaries, no matter whether they are of an economic, legal, political or any other character, whether they be private or official.")।

এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল এই রকম ঃ **প্রথমত**, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর অর্থ এই যে শুধু রাষ্ট্রের বিদেশনীতি বিশ্লেষণ করাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একমাত্র কাজ নয়। একইভাবে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কেবল কূটনীতির ইতিহাস হিসাবে যে ধারণা করা হত সে ধারণাও সঠিক নয়। **দ্বিতীয়ত**, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক অনুধাবন করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু রাষ্ট্রের নীতি ও কাজকর্মের দিকেই দৃষ্টি দেয় না, রাষ্ট্রের ভিতরের বেসরকারি স্তরও তার অনুসন্ধানের এলাকায় পড়ে। অর্থাৎ, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীরও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান থাকতে পারে সে কথা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্বীকার করে। **তৃতীয়ত**, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত, বিরোধিতা, সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতায় পড়ে। কিন্তু একই সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রীর অনুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ এবং এই সহযোগিতা, বোঝাপড়া ও শুভবুদ্ধির প্রেক্ষাপটে যে সব বিশ্বশান্তি ও কল্যাণকামী বিশ্বসংস্থা পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে তাদের নীতি ও কাজকর্মের সাফল্য-ব্যর্থতার মূল্যায়নও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাজ। বলা বাহুল্য, সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এই কাজ করে থাকে এবং এতেই প্রমাণিত হয় যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ বিদ্যা নয়।

প্রকৃতি

মূল্যবোধ-অনুসারী হলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অবশ্য নিছক বিমূর্ত তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। ইদানীংকালে তার যাবতীয় তত্ত্বই গড়ে উঠেছে তথ্যের ওপর নির্ভর করে। এছাড়া, পঞ্চাশের দশক থেকে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিরও বহুল ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। এর ফলে সমাজবিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট শাখা হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্যতা এখন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি বা আলোচ্য বিষয় (Scope of International Relations) ঃ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এক গতিশীল বিদ্যা। তার পরিধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তার আলোচনার ক্ষেত্রে নিত্য নতুন বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটছে। বিষয় হিসাবে তার এই

পরিবর্তনশীলতার মূল কারণ হল এই যে, যে বিশ্বসমাজের পটভূমিতে তার সক্রিয়তা সেই পটভূমিতে নিরন্তর গুরুতর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদ্ভবের সময় পৃথিবীর চেহারা যেমন ছিল আজকের পৃথিবীর চেহারা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। বস্তুত, গত আট দশকে প্রতিটি রাষ্ট্রে এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমাজে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তা এক কথায় অভাবনীয়। স্বভাবতই তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার ধারায় ঘন ঘন পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান পরিধি

বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক আইনের বিচার ও ব্যাখ্যা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে বিভিন্ন দিকে। যেমন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসামান্য অগ্রগতি, বহু নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই অতি-বৃহৎ শক্তির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে ঠান্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব, বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আঞ্চলিক জোটের সক্রিয়তা, নতুন স্বাধীন দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভের উদ্যোগ, ইত্যাদি পরিবর্তনে আলোড়িত হতে থাকে সারা পৃথিবী।

এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালে পররাষ্ট্র সম্পর্ক সংক্রান্ত কাউন্সিলের রিপোর্টে গ্রেসন কার্ক (Grayson Kirk) সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার পরিধি স্থির করেন। তাঁর মতে, যে পাঁচটি বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার আওতায় পড়ে সেগুলি হল ঃ

কার্ক প্রণীত তালিকা

(১) রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি ও পরিচালনা,
(২) যে সব উপাদান রাষ্ট্রশক্তিকে প্রভাবিত করে,
(৩) পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক অবস্থান ও বিদেশনীতি,
(৪) সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস,
(৫) একটি স্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ।

মূলত কার্কের তৈরি করা এই তালিকার ওপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে আরও নানা লেখক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে তার পরিধিকে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভিনসেন্ট বেকার (Vincent Baker), কুইন্সি রাইট (Quincy Wright), হান্স মরগেনথউ, পামার ও পারকিন্স, জোসেফ ফ্রাঙ্কেল (Joseph Frankel), থিয়োডোর কলমবিস ও জেম্স উল্ফ (Theodore Couloumbis and James Wolfe) এবং জন বেলিস ও স্টিভ স্মিথ (John Baylis and Steve Smith)। এঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার পরিধি নির্ধারণ করতে গিয়ে এঁদের প্রত্যেকেই

কুইন্সি রাইটের তালিকা

সমকালীন আন্তর্জাতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেমন নতুন নতুন দিকে প্রসারিত হয়েছে তেমনই তাঁরা নতুন নতুন বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় এনেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে কুইন্‌সি রাইট প্রধানত যে আটটি বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন সেগুলি ছিল ঃ

(১) আন্তর্জাতিক আইন,
(২) কূটনীতির ইতিহাস,
(৩) সামরিক বিজ্ঞান ও যুদ্ধের প্রযুক্তিগত কলাকৌশল,
(৪) আন্তর্জাতিক রাজনীতি,
(৫) আন্তর্জাতিক সংগঠন,
(৬) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য,
(৭) ঔপনিবেশিক সরকার,
(৮) পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা ও তার নিয়ন্ত্রণ।

লক্ষণীয় যে, কুইন্‌সি রাইটের এই তালিকায় জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে বৈষম্য, পারমাণবিক সমরসজ্জার প্রতিযোগিতা, বিশ্ব পরিবেশ, মানবাধিকার রক্ষা, বিশ্ব জনমত, বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা, আঞ্চলিক জোট ও সহযোগিতা, তৃতীয় বিশ্বের উত্থান, ইত্যাদি বহু বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে। এর কারণ হল এই যে, পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে এই সব বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। এছাড়া, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় বিশ্লেষণ পদ্ধতি স্থির করার মতো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিও তখন দেখা দেয় নি। আবার আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সর্বজনীন চরিত্র দেওয়ার জন্য তত্ত্ব তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার মতো অবস্থাও তখনও দেখা দেয় নি। অন্যদিকে কুইন্‌সি রাইট এই তালিকা প্রণয়ন করার প্রায় পঁচিশ বছর পরে যখন কলমবিস ও উল্ফ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার পরিধি স্থির করতে সচেষ্ট হন তখন আন্তর্জাতিক জগতের ছবি অনেকটাই বদলে গেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেক নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁরা অনেক নতুন বিষয় নিয়ে একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেন। এই তালিকাটি ছিল এই রকম ঃ

কলমবিস ও উল্ফ

(১) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা পদ্ধতি,
(২) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব,
(৩) জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদ,
(৪) জাতীয় শক্তি,
(৫) জাতীয় স্বার্থ,

(৬) জাতীয় রাষ্ট্রের বিদেশনীতি,
(৭) কূটনীতি,
(৮) যুদ্ধ,
(৯) শক্তিসাম্য,
(১০) আন্তর্জাতিক আইন,
(১১) আন্তর্জাতিক সংগঠন,
(১২) আন্তর্জাতিক স্তরে কল্যাণমূলক কাজকর্ম,
(১৩) আন্তর্জাতিক অর্থনীতি,
(১৪) ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে বৈষম্য,
(১৫) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নতুন কুশীলব (actors),
(১৬) মানবসভ্যতার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ।

এই তালিকাটি যথেষ্ট দীর্ঘ ও বিশদ হলেও আজকের দিনে অনেকের চোখেই এর সীমাবদ্ধতা ধরা পড়বে। কুইন্‌সি রাইটের তালিকার সীমাবদ্ধতার মতো এই সীমাবদ্ধতাও একই কারণে। অর্থাৎ, আশির দশকের গোড়ার দিকে যখন এই তালিকা তৈরি হয় তখন পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার নিয়ে, মানবাধিকার নিয়ে, দারিদ্র, উন্নয়ন ও ক্ষুধা নিয়ে, পরিবেশগত উন্নয়ন নিয়ে এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে আজকের মতো বিশ্বজনমত এত প্রবল হয়ে ওঠে নি এবং রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে এই সব বিষয়ে ইদানীংকালের মতো এমন ব্যাপক উদ্যোগও নেওয়া হয় নি। আবার বিশ্বায়ন ও তার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনও তখন দেখা দেয় নি।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সব সাম্প্রতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ১৯৯৭ সালে বেলিস ও স্মিথ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় যে সব নতুন বিষয় নিয়ে আসেন সেগুলি ছিল এই রকম ঃ

(১) বিশ্বায়নের পটভূমিতে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি,
(২) পরিবেশগত সমস্যাসমূহ,
(৩) পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার,
(৪) জাতীয়তাবাদ,
(৫) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সংঘাত,
(৬) বিশ্বরাজনীতি ও মানবকল্যাণমূলক কাজকর্ম,
(৭) আঞ্চলিকতাবাদ ও জোটবদ্ধতা,
(৮) বিশ্ববাণিজ্য ও অর্থ,
(৯) দারিদ্র, উন্নয়ন ও ক্ষুধা,
(১০) মানবাধিকারসমূহ,
(১১) নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়সমূহ (Gender Issues)।

বেলিস ও স্মিথের তৈরি করা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের এই তালিকা এই মুহূর্তের আন্তর্জাতিক অবস্থার পটভূমিতে সঠিক ও সম্পূর্ণ বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু আগামী দিনে এই তালিকা সংশোধনের যে প্রয়োজন হবে না এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কী ধরনের পরিবর্তন দেখা দেবে তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

এর অর্থ এই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এমনই এক গতিশীল ও পরিবর্তনশীল বিষয় যার আলোচনার পরিধি স্থায়ীভাবে ও চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা কখনই সম্ভব নয়। তবে একুশ শতকের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগতে যে সব পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় স্থির করা যেতে পারে এইভাবে :

মূল আলোচ্য বিষয়

প্রথমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কখনও বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে না। একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ, একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্তরে কী অবস্থান নেবে, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে তার জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় জনমত এবং জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর। অতএব *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় বিষয় হিসাবে জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতি, জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।*

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে এবং পারমাণবিক অস্ত্রের বিপদ থেকে মুক্ত করে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা আজকের আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির অন্যতম কাজ। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের শাসন বজায় রাখাও বিশেষ জরুরি। কাজেই *যুদ্ধ, বিশ্বশান্তি, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক আইন নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়।*

তৃতীয়ত, আজকের দুনিয়ায় সকলেই স্বীকার করেন যে শুধু যুদ্ধই পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ করে না, ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যও বিশ্বশান্তির এক প্রধান অন্তরায়। বস্তুত, এই কারণেই রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন শাখা সংগঠন এখন কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মে অগ্রাধিকার দিচ্ছে তাদের কর্মসূচিতে। একই সঙ্গে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক অবস্থান নেওয়ার ফলেও অনেক সময় বিশ্বসমাজের আবহাওয়া কলুষিত হয়ে উঠে বিশ্বশান্তিকে বিঘ্নিত করছে। এ সব ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে তৎপর হচ্ছে অনেক ব্যক্তি ও বেসরকারি সংস্থা। অতএব, *ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং এই বৈষম্য দূরীকরণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভূমিকা, মানবাধিকার রক্ষা, স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং নানারকমের কল্যাণমূলক কাজে* আন্তর্জাতিক সংগঠন, জাতীয় সংস্থা তথা বেসরকারি স্তরে উদ্যোগ ও সক্রিয়তাও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চতুর্থত, ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানে পৃথিবী এখন যে ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা হল বিশ্বায়ন। আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যে সমতা ও ঐক্য আনা বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য হলেও কার্যক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির এতে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার, এমনকী জাতীয় সার্বভৌমিকতার প্রশ্নে আপস করারও সম্ভাবনা থেকে যায়। স্বভাবতই *বিশ্বায়ন আজকের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চার এক মুখ্য বিষয়।*

পঞ্চমত, পারমাণবিক সমরাস্ত্র আজকের পৃথিবীর সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সূচনা করেছে। অবশ্য রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বায়নের মতোই এই পদক্ষেপের মধ্যে এক ধরনের পক্ষপাতমূলক নীতি নিহিত আছে যা তৃতীয় বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলির পক্ষে ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্বভাবতই তাই বিশ্বায়নের মতোই *পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের নিরপেক্ষ ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক জরুরি আলোচ্য বিষয়।*

ষষ্ঠত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আঞ্চলিকতাবাদ প্রধানত সামরিক জোটের মধ্য দিয়েই প্রকট হতে থাকে। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় সামরিক জোটের প্রাধান্য আর নেই। তার জায়গায় স্থান নিয়েছে নতুন ধরনের জোট। এই জোট এখন তৈরি হচ্ছে মূলত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তিতে। অর্থাৎ, ধনী ও প্রাগ্রসর দেশগুলি নিজেদের স্বার্থরক্ষায় নানা ধরনের জোটে আবদ্ধ হচ্ছে। পাশাপাশি অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশগুলিও এখন নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন জোট বেঁধে পাল্লা দিতে সচেষ্ট হচ্ছে। ফলে আঞ্চলিকতাবাদ ও জোটবদ্ধতা এক নতুন মাত্রা লাভ করছে। *নতুন চেহারার এই আঞ্চলিকতাবাদ ও জোটবদ্ধতা সঙ্গত কারণেই তাই আজ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় স্থান করে নিচ্ছে।*

সপ্তমত, সাধারণ ও অভিন্ন স্বার্থ শুধু তৃতীয় বিশ্বকে নির্জোট আন্দোলনেরই সামিল করে নি, তাকে আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের সুযোগ করে দিয়েছে। এক কথায়, তৃতীয় বিশ্বকে উপেক্ষা করে বিশ্বরাজনীতি এখন আর এক কদমও এগোতে পারে না। ফলত *তৃতীয় বিশ্ব আজ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক আবশ্যিক আলোচ্য বিষয়।*

পরিশেষে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক এখন খুবই ঘনিষ্ঠ এবং সংস্কৃতি ও ভাবধারার স্বচ্ছন্দ বিনিময়ের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকরা এখন পরস্পরের খুবই কাছাকাছি আসতে সক্ষম। এক কথায়, প্রযুক্তিগত উন্নতি আজকের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রা ও তাৎপর্য দিয়েছে। কাজেই *প্রযুক্তিগত অগ্রগতিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় উপেক্ষা করার মতো বিষয় নয়।*